কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১০

সূরা আনকাবুত ১-১৩ আয়াত

আল আনকাবূত কুরআনের ২৯ তম সূরা। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর আয়াত সংখ্যা ৬৯টি। রুকু সংখ্যা ৭।

নামকরণ

একচল্লিশের আয়াতের অংশবিশেষ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে আনকাবুত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি সে সূরা। الْعَنْكَبُوْتِ (আনকাবূত) শব্দের অর্থ মাকড়সা। উক্ত সূরাতে 'মাকড়সা' সংক্রান্ত একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে বিধায় এ সূরাকে আনকাবূত নামে নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

৫৬ থেকে ৬০ আয়াতের মধ্যে যে বক্তব্য এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এ সূরাটি হাবশায় হিজরতের কিছু আগে নাযিল হয়েছিল। অধিকন্তু বিষয়বস্তু গুলোর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও একথাই সমর্থন করে। কারণ, পশ্চাতপটে সে যুগের অবস্থার চিত্র ঝলকে উঠতে দেখা যায়। যেহেতু এর মধ্যে মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে এবং মুনাফিকীর প্রথম দশটি আয়াত হচ্ছে মাদানী এবং বাকি সমস্ত সূরাটি মক্কী। অথচ এখানে যেসব লোকের মুনাফিকীর কথা বলা হয়েছে তারা কেবল কাফেরদের জুলুম, নির্যাতন ও কঠোর শারীরিক নিপীড়নের ভয়ে মুনাফিকী অবলম্বন করছিল। আর একথা সুস্পষ্ট, এ ধরনের মুনাফিকীর ঘটনা মক্কায় ঘটতে পারে, মদীনায় নয়। এভাবে এ সূরায় মুসলমানদেরকে হিজরত করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, এ বিষয়টি দেখেও কোন কোন মুফাসসির একে মক্কায় নাযিলকৃত শেষ সূরা গণ্য করেছেন।। অথচ মদীনায় হিজরতের আগে মুসলমানগণ হাবশায়ও হিজরত করেছিলেন। এ ধারণাগুলো আসলে কোন হাদীসের ভিত্তিতে নয়। বরং শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। আর সমগ্র সূরার বিষয়বস্তুর ওপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য মক্কার শেষ যুগের নয় বরং এমন এক যুগের অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে যুগে মুসলমানদের হাবশায় হিজরত সংঘটিত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বক্তব্য

সূরাটি পড়লে মনে হবে এটি যখন নাযিল হচ্ছিল তখন মক্কায় মুসলমানরা মহা বিপদ-মুসিবতের মধ্যে অবস্থান করছিল। কাফেরদের পক্ষ থেকে পূর্ণ শক্তিতে চলছিল ইসলামের বিরোধিতা এবং মু'মিনদের ওপর চালানো হচ্ছিল কঠোর জুলুম-নিপীড়ন। এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিকে সাচ্চা ঈমানদারদের লজ্জা দেবার জন্য এ সূরাটি নাযিল করেন। এই সাথে এর মধ্যে মক্কায় কাফেরদেরকেও এ মর্মে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, নিজেদের জন্য এমন পরিণতি ডেকে এনো না সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা প্রতি যুগে যার সম্মুখীন হয়ে এসেছে।

সে সময় কিছু কিছু যুবক যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন এ প্রসঙ্গে তারও জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন তাদের পিতা-মাতারা তাদের ওপর মুহাম্মদ (সা.) এর দ্বীন ত্যাগ করে তাদের দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করতো। তাদের পিতা-মাতারা বলতো, যে কুরআনের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো তাতেও তো লেখা আছে যে, মা-বাপের হক সবচেয়ে বেশি। কাজেই আমরা যা কিছু বলছি তাই তোমরা মেনে নাও। নয়তো তোমরা নিজেদের ঈমান বিরোধী কাজে লিপ্ত হবে। ৮ আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোন কোন নওমুসলিমকে তাদের গোত্রের লোকেরা বলতো, তোমরা আমাদের কথা মেনে নাও এবং ঐ ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে যাও, এ জন্য আযাব-সওয়াব যাই হোক, তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করছি। যদি এ জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন তাহলে আমরা অগ্রবর্তী হয়ে বলে দেবোঃ জনাব, এ বেচারাদের কোন দোষ নেই। আমরাই এদেরকে ঈমান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলাম। কাজেই আমাদের পাকড়াও করুন। এর জবাব দেয়া হয়েছে ১২-১৩ আয়াতে।

এ সূরায় যে কাহিনীগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেখানেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ দিকটিই সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীদেরকে দেখো, তারা কেমন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। কত দীর্ঘকাল ধরে তারা নির্যাতিত হয়েছেন। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সাহায্য করা হয়েছে। কাজেই ভয় পেয়ো না। আল্লাহর সাহায্য নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু পরীক্ষার একটি সময়কাল অতিবাহিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকেও এ কাহিনীগুলোতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও হতে দেরি হয়, তাহলে তাতে আর কোনদিন পাকড়াও হবেই না বলে মনে করে নিয়ো না। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ তোমাদের সামনে রয়েছে। দেখে নাও, শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ হয়েই গেছে এবং আল্লাহ তার নবীদেরকে সাহায্য করেছেন।

তারপর মুসলমানদেরকে এভাবে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, জুলুম নির্যাতন যদি তোমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে ঈমান পরিত্যাগ করার পরিবর্তে তোমরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করে বের হয়ে যাও। আল্লাহর যমীন অনেক প্রশস্ত। যেখানে আল্লাহর বন্দেগী করার সুযোগ আছে সেখানে চলে যাও।

এসব কথার সাথে সাথে কাফেরদেরকে বুঝাবার দিকটিও বাদ দেয়া হয়নি। তাওহীদ ও আখেরাত উভয় সত্যকে যুক্তিসহকারে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। শির্ককে খণ্ডন করা হয়েছে। বিশ্ব-জাহানের নির্দশনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আমার নবী তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছেন এ নির্দশনাবলী তার সত্যতা প্রমাণ করছে।

الٓمٓ

১. আলিফ-লাম-মীম

আলিফ, লাম, মীমঃ এ হরফগুলোকে কুরআনের পরিভাষায় ‘হরূফে মুকাত্তা'আত' বলা হয়। ঊনত্রিশটি সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের হরূফে মুকাত্তা’ আত ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোর সংখ্যা ১৪টি। মূলতঃ এ অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন করে পড়া হয়ে থাকে। যথা---(الف - لام - ميم) (আলিফ্-লাম্-মীম্)। এ বর্ণগুলো তাদের নিকট প্রচলিত ভাষার বর্ণমালা হতে গৃহীত। যা দিয়ে তারা কথা বলে এবং শব্দ তৈরী করে।

কিন্তু কি অর্থে এবং এসব আয়াত বর্ণনার কি রহস্য রয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে চারটিঃ ১) এগুলোর কোন অর্থ নেই, কেবলমাত্র আরবী বর্ণমালার হরফ হিসেবে এগুলো পরিচিত। ২) এগুলোর অর্থ আছে কিনা তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, আমরা এগুলোর অর্থ সম্পর্কে কিছুই জানিনা। আমরা শুধুমাত্র তিলাওয়াত করবো। ৩) এগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, কারণ কুরআনের কোন বিষয় বা কোন আয়াত বা শব্দ অর্থহীনভাবে নাযিল করা হয়নি। কিন্তু এগুলোর অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। অন্য কেউ এ আয়াতসমূহের অর্থ জানেনা, যদি কেউ এর কোন অর্থ নিয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণভাবে ভুল হবে। আমরা শুধু এতটুকু বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কুরআনের কোন অংশ অনর্থক নাযিল করেননি। ৪) এগুলো 'মুতাশাবিহাত' বা অস্পষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। এ হিসাবে অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরূফে মুকাত্তা' আতগুলো এমনি রহস্যপূর্ণ যার প্রকৃত মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। কিন্তু 'মুতাশবিহাত' আয়াতসমূহের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে থাকলেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ এগুলো থেকে হেদায়াত গ্রহণ করার জন্য এগুলোর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌র নামের তত্ত্ব বিশেষ। আবার অনেকে এগুলোর স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থও করেছেন। [তাফসীরে জাকারিয়া]

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنۡ يُّتۡرَكُوۡۤا اَنۡ يَّقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا وَ هُمۡ لَا يُفۡتَنُوۡنَ

২. মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?

يُفۡتَنُوۡنশব্দটি فتنةথেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। ঈমানদার বিশেষত: নবীগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা জান ও মালের উপর ছিল। [ফাতহুল কাদীর] এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের দৃঢ়তার পরীক্ষা হয়ে যেত। কোন সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অধিকাংশ নবীগণ, শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেয়া হয়েছে।

বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায়, আলোচ্য আয়াত সেসব সাহাবীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল, যারা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সৎকর্মপরায়ন বান্দাদেরকে, তারপর তাদের অনুরূপ, তারপর তাদের অনুরূপদেরকে। প্রত্যেক মানুষকে তার দ্বীনদারী অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি দ্বীনদারী বেশী হয় তাকে বেশী পরীক্ষা করা হয়। [তিরমিযী ২৩৯৮, ইবনে মাজাহ ৪০২৩] কুরআনের অন্যত্রও এ পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে, যেমন: "তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে অথচ, আল্লাহ এখনো তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে তাদের জেনে নেননি।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১৬]

যে অবস্থায় একথা বলা হয় তা ছিল এই যে, মক্কা মুআযযিমায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ আপদ ও জুলুম-নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোন প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করে নি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করে খাব্বাব ইবনে আরত বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, 'যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন।

আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দোআ করেন না? একথা শুনে তাঁর চেহারা আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যেসব মুমিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দুটুকরা করে দেয়া হতো। কারো অংগ-প্রত্যংগের সন্ধিস্থলে কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বারামাউত পর্যন্ত নিঃশংক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না।" [বুখারী ৩৬১২, মুসনাদে আহমাদ ৫/১০৯]

এ চিত্তচাঞ্চল্যকে অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করার জন্য মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে বুঝান, দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তি নিছক মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং প্রত্যেক দাবীদারকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষা অতিক্রম করতে হবেই। অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ "তোমরা কি মনে করেছে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারগণ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ-ক্লেশের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল। এই মর্মে যে) জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৪]

অনুরূপভাবে ওহুদ যুদ্ধের পর যখন মুসলিমদের ওপর আবার বিপদ-মুসীবতের একটি দুযোগপূর্ণ যুগের অবতারণা হয় তখন বলা হয়ঃ "তোমরা কি মনে করে নিয়েছে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী?" [সূরা আলে ইমরান: ১৪২] প্রায় একই বক্তব্য সূরা আলে ইমরানের ১৭৯, সূরা তাওবার ১৬ এবং সূরা মুহাম্মাদের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলিমদের মনে এ সত্যটি গেথে দিয়েছেন যে, পরীক্ষাই হচ্ছে এমন একটি মানদণ্ড যার মাধ্যমে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করা যায়। [তাফহীমুল কুরআন]

وَ لَقَدۡ فَتَنَّا الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَلَيَعۡلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ صَدَقُوۡا وَ لَيَعۡلَمَنَّ الۡكٰذِبِيۡنَ

৩. আর অবশ্যই আমরা এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী।

তোমাদের সাথে যা কিছু হচ্ছে, তা কোন নতুন ব্যাপার নয়। ইতিহাসে হরহামেশা এমনটিই হয়ে এসেছে। যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবী করেছে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করা হয়েছে। আর অন্যদেরকেও যখন পরীক্ষা না করে কিছু দেয়া হয়নি তখন তোমাদের এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, কেবলমাত্র মৌখিক দাবীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে দেয়া হবে?

এই সকল আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, সাহাবা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট মক্কার কাফেরদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা অভিযোগ করে দু'আর আবেদন জানালেন, যাতে আল্লাহ তাঁদের সাহায্য করেন। তিনি বললেন, দুখঃ-কষ্ট ভোগ করা ঈমানদারদের ইতিহাসের একটি অংশ। তোমাদের পূর্বের কোন কোন মু'মিনকে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে করাত দিয়ে তাকে দু'ফাঁক করে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের শরীর হতে গোশত আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত অত্যাচার তাদেরকে হক পথ হতে ফেরাতে পারেনি। (বুখারীঃ আম্বিয়ার হাদীস অধ্যায়) আম্মার, তাঁর মাতা সুমাইয়্যাহ ও পিতা ইয়াসির, সুহায়েব, বিলাল ও মিকদাদ (রাঃ) ইত্যাদি সাহাবাদের উপর ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যে অত্যাচারের পাহাড় ভাঙ্গা হয়েছিল তা ইতিহাসের পাতায় আজও সংরক্ষিত আছে। এই পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীই এসব আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। পরন্তু আয়াতের সাধারণ অর্থের দিক দিয়ে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সকল ঈমানদারও এতে শামিল। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

এখানে لَيَعۡلَمَنَّএর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন"। অর্থাৎ এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা, খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে যায়। [মুয়াসসার] আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলার জানা রয়েছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন। [তাফহীমুল কুরআন]

বস্তুত: মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। ভাল-মন্দ, ধনী-গরিব, দুঃখকষ্ট, সার্বিক অবস্থায় ফেলে তিনি তাদের পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এসমস্ত অবস্থায় বিশ্বাসে সন্দেহ হলে যদি সে তা তাড়িয়ে দিয়ে ঈমানের উপর স্থির থাকতে পারে তবেই সে সফলকাম। অনুরূপভাবে তার প্রবৃত্তির পাগলা ঘোড়া তাকে যা ইচ্ছে তা করতে বললে সে যদি তা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে তবেই সে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও পাশ করেছে বলে বিবেচিত হবে।

اَمۡ حَسِبَ الَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ اَنۡ يَّسۡبِقُوۡنَا ؕ سَآءَ مَا يَحۡكُمُوۡنَ

৪. তবে কি যারা মন্দকাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

মূল শব্দ হচ্ছে سابقঅর্থাৎ আমার থেকে এগিয়ে যাবে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে, "আমার পাকড়াও এড়িয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে।" অপর অর্থ হচ্ছে, তারা কি মনে করে যে, তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও গোনাহসমূহ এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ এগুলো থেকে উদাসীন হয়ে যাবেন? আর এজন্যই কি তারা অপরাধগুলো করে যাচ্ছে? [সা'দী]

কারও কারও মতে, এখানে এর অর্থ হচ্ছে, যা কিছু আমি করতে চাই তা করতে আমার সফল না হওয়া এবং যা কিছু তারা করতে চায় তা করতে তাদের সফল হওয়া। আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, যারা অপরাধী তারা যেন এটা মনে না করে যে, তারা পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ে যাবে। তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। এ ধারণা কখনো ঠিক নয়। তারা যদি এ দুনিয়াতে পারও পেয়ে যায়, তাদের সামনে এমন শাস্তি ও আযাব রয়েছে তা তাদের জন্য যথেষ্ট। [ইবনে কাসীর]

مَنۡ كَانَ يَرۡجُوۡا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ

৫. যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসবেই। আর তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

যে ব্যক্তি আখেরাতের জীবনে বিশ্বাসই করে না এবং মনে করে, কারো সামনে নিজের কাজের জবাবদিহি করতে হবে না এবং এমন কোন সময় আসবে না যখন নিজের জীবনের যাবতীয় কাজের কোন হিসেবা-নিকেশ দিতে হবে, তার কথা আলাদা। সে নিজের গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকুক এবং নিশ্চিন্তে যা করতে চায় করে যাক। নিজের আন্দাজ-অনুমানের বিপরীত নিজের পরিণাম সে নিজেই দেখে নেবে। কিন্তু যারা আশা রাখে, এক সময় তাদেরকে তাদের মা'বুদের সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে, তাদের এ ভুল ধারণায় ডুবে থাকা উচিত নয় যে, মৃত্যুর সময় অনেক দূরে। তাদের তো মনে করা উচিত, সে সময় অতি নিকটেই এসে গেছে এবং কাজের অবকাশ খতম হবারই পথে। তাই নিজের শুভ পরিণামের জন্য তারা যা কিছু করতে চায় করে ফেলুক। দীর্ঘ জীবন-কালের ভিত্তিহীন নির্ভরতার ওপর ভরসা করে নিজের সংশোধনে বিলম্ব করা উচিত নয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কাজেই যে তার রব-এর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রব-এর ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে"। [সূরা আল-কাহাফ: ১১০]

তাদের এ ভুল ধারণাও পোষণ করা উচিত নয় যে, এমন কোন বাদশাহর সাথে তাদের ব্যাপার জড়িত, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। যে আল্লাহর সামনে তাদের জবাবদিহি করার জন্য হাজির হতে হবে তিনি বেখবর নন বরং সবকিছু শোনেন ও জানেন। তাঁর কাছে তাদের কোন কথা গোপন নেই। [ইবনে কাসীর] তিনি জানেন কে কোন নিয়তে কাজ করে, আরও জানেন কে তাঁর মহব্বতের উপযুক্ত আর কে উপযুক্ত নয়। [সা'দী]

وَ مَنۡ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفۡسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ

৬. আর যে কেউ প্রচেষ্টা চালায়, সে তো নিজের জন্যই প্রচেষ্টা চালায়; আল্লাহ তো সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।

"মুজাহাদা" শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা ও সাধনা করা। আর যখন কোন বিশেষ বিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা হয় না বরং সাধারণভাবে "মুজাহাদা" শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন এর অর্থ হয় একটি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মু'মিনকে এ দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম করতে হয় তা হচ্ছে এ ধরনের। তাকে শয়তানের সাথেও লড়াই করতে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ সৎকাজের ক্ষতির ভয় দেখায় এবং অসৎকাজের লাভ ও স্বাদ উপভোগের লোভ দেখিয়ে বেড়ায়। তাকে নিজের নফসের বা কুপ্রবৃত্তির সাথেও লড়তে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ নিজের খারাপ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার দাসে পরিণত করে রাখার জন্য জোর দিতে থাকে। নিজের গৃহ থেকে নিয়ে বিশ্ব-সংসারের এমন সকল মানুষের সাথে তাকে লড়তে হয় যাদের আদর্শ, মতবাদ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি, রসম-রেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধারা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান সত্য দ্বীনের সাথে সংঘর্ষশীল। তাকে এমন রাষ্ট্রের সাথেও লড়তে হয় যে আল্লাহর আনুগত্যমুক্ত থেকে নিজের ফরমান জারী করে এবং সততার পরিবর্তে অসততাকে বিকশিত করার জন্য শক্তি নিয়োগ করে। এ প্রচেষ্টা-সংগ্রাম এক-দু'দিনের নয়, সারাজীবনের। দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের। কোন একটি ময়দানে নয় বরং জীবনের প্রত্যেকটি ময়দানের ও প্রতিটি দিকে। [তাফহীমুল কুরআন]

আল্লাহ এ জন্য তোমাদের কাছে এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের দাবী করছেন না যে, নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন, বরং এটিই তোমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ, তাই তিনি তোমাদের এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ পথে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন শক্তির অধিকারী হতে পারো যার ফলে দুনিয়ায় তোমরা কল্যাণ ও সুকৃতির ধারক এবং আখেরাতে আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হবে। এ যুদ্ধ চালিয়ে তোমরা আল্লাহর কোন উপকার করবে না বরং তোমরা নিজেরাই উপকৃত হবে। তাছাড়া এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পার যার কথা সূরার শুরুতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। [ইবনে কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী, ইবনুল কাইয়্যেম, শিফাউল আলীল: ২৪৬]

وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ وَ لَنَجۡزِيَنَّهُمۡ اَحۡسَنَ الَّذِىۡ كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ

৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমরা অবশ্যই তাদের থেকে তাদের মন্দকাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং আমরা অবশ্যই তাদেরকে তারা যে উত্তম কাজ করত, তার প্রতিদান দেব।

ঈমান অর্থ এমন সব জিনিসকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া, যেগুলো মেনে নেবার জন্য আল্লাহ, তার রসূল ও তার কিতাব দাওয়াত দিয়েছে। আর সৎকাজ হচ্ছে, আল্লাহ ও তার রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। মানুষের চিন্তাধারা, ধারণা-কল্পনা ও ইচ্ছার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কেও সৎকাজ। খারাপ কথা না বলা এবং হক-ইনসাফ ও সত্য-সততা অনুযায়ী সব কথা বলাই হচ্ছে কণ্ঠের সৎকাজ। আর মানুষের সমগ্র জীবন আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর মধ্যে এবং তার বিধানসমূহ মেনে চলে অতিবাহিত করাই হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের সৎকাজ। এ ঈমান ও সৎকাজের দু'টি ফল বর্ণনা করা হয়েছে।

একঃ মানুষের দুষ্কৃতি ও পাপগুলো তার থেকে দূর করে দেয়া হবে।

দুইঃ তার সর্বোত্তম কাজসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। পাপ ও দুষ্কৃতির কয়েকটি অর্থ হয়। একটি অর্থ হচ্ছে ঈমান আনার আগে মানুষ যতই পাপ করে থাকুক না কেন ঈমান আনার সাথে সাথেই তা সব মাফ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান আনার পর মানুষ বিদ্রোহ প্রবণতা সহকারে নয় বরং মানবিক দুর্বলতা বশত যেসব ভুল-ত্রুটি করে থাকে, তার সৎকাজের প্রতি নজর রেখে সেগুলো উপেক্ষা করা হবে। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান ও সৎকর্মশীলতার জীবন অবলম্বন করার কারণে আপনা-আপনিই মানুষের নফসের সংশোধন হয়ে যাবে এবং তার অনেকগুলো দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে। ঈমান ও সৎকাজের প্রতিদান সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছেঃ **لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ** এর দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছেঃ মানুষের সৎকাজগুলোর মধ্যে যেটি হবে সবচেয়ে ভালো সৎকাজ, তাকে সামনে রেখে তার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার নির্ধারণ করা হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মানুষ তার কার্যাবলীর দৃষ্টিতে যতটা পুরস্কারের অধিকারী হবে তার চেয়ে বেশি ভালো পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। একথাটি কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার থেকে দশগুণ বেশি দেয়া হবে।" (আনআমঃ ১৬০ আয়াত)

সূরা আল কাসাসে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে"

সূরা নিসায় বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ তো কণামাত্র ও জুলুম করেন না এবং সৎকাজ হলে তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন।"

وَ وَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ حُسۡنًا ؕ وَ اِنۡ جَاهَدٰكَ لِتُشۡرِكَ بِىۡ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ فَلَا تُطِعۡهُمَا ؕ اِلَىَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ

৮. আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদেরকে মেনো না আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসা। অতঃপর তোমরা কি করছিলে তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।

কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের ও ইবাদতের আদেশ দানের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করারও আদেশ দিয়েছেন। যাতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর প্রতিপালকত্ব ও উপাস্যত্বের চাহিদা তারাই সঠিকভাবে বুঝতে ও পূরণ করতে পারে, যারা পিতা-মাতার আনুগত্য ও খিদমতের চাহিদাকে বুঝে ও পূরণ করে থাকে। যে ব্যক্তি এ কথা বুঝতে অক্ষম যে, পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব তার মাতা-পিতার মিলনের একান্ত ফল এবং তার লালন-পালন তাদের সীমাহীন করুণা ও মায়া-মমতার ফসল। অতএব তাদের খিদমতে কোন প্রকার অনীহা ও তাদের কথার কোন প্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ করা কোনক্রমেই সন্তানের উচিত নয়। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান অবশ্যই সৃষ্টিকূলের সৃষ্টিকর্তাকে বুঝতে এবং তাঁর একত্ববাদ ও ইবাদতের চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম। এই কারণেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকীদ হাদীসেও এসেছে। এক হাদীসে মাতা-পিতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁদের অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ বলা হয়েছে। (সূরা ইসরা' ২৩-২৪ আয়াত দ্রষ্টব্য)

হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন; সময়মত সালাত আদায় করা। বললঃ তারপর কোনটি? তিনি বললেনঃ পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। বললঃ তারপর কোনটি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদ। [বুখারী: ৫৯৭০]

আয়াতে বর্ণিত “যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না” বাক্যাংশটিও অনুধাবনযোগ্য। এর মধ্যে তাদের কথা না মানার সপক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। এতে শির্কের জঘন্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ শির্কের সপক্ষে কোন জ্ঞান নেই। কেউ শির্ককে সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারবে না। [সা’দী] এটা পিতা-মাতার অধিকার যে, ছেলেমেয়েরা তাদের সেবা করবে, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং বৈধ বিষয়ে তাদের কথা মেনে চলবে। কিন্তু শির্কের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন গোনাহর কাজেও নয়। যেমনটি রাসূলের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। [মুয়াস্‌সার]

এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, মানুষ নিজের জ্ঞানের বিরুদ্ধে পিতামাতার অন্ধ অনুকরণ করবে। শুধুমাত্র বাপ-মায়ের ধর্ম বলেই তাদের ছেলে বা মেয়ের সেই ধর্ম মেনে চলার কোন কারণ নেই। সন্তান যদি এ জ্ঞান লাভ করে যে, তার বাপ-মায়ের ধর্ম ভুল ও মিথ্যা তাহলে তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার সঠিক ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের চাপ প্রয়োগের পরও যে পথের ভ্রান্তি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সে পথ অবলম্বন করা তার উচিত নয়। বাপ-মায়ের সাথে যখন এ ধরনের ব্যবহার করতে হবে তখন দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেও এ ব্যবহার করা উচিত। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির সত্য পথে থাকা সম্পর্কে জানা যাবে ততক্ষণ তার অনুসরণ করা বৈধ নয়।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহর নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শির্ক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়। [মুসনাদে আহমাদ: ১/১৩১] কোন কোন বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন এবং অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। তার মাতা হামনা বিনতে সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। [মুসলিম: ১৭৪৮]

এই আয়াত সাদকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাদের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিনদিন তিনরাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে সা’দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহর ফরমানের মোকাবেলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেনঃ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ’ আত্মা থাকত, এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তার মাতা অনশন ভঙ্গ করল। [বাগভী]

এ দুনিয়ার আত্মীয়তা এবং আত্মীয়দের সাহায্য-সহযোগিতা কেবলমাত্র এ দুনিয়ার সীমা-ত্রিসীমা পর্যন্তই বিস্তৃত। সবশেষে পিতা-মাতা ও সন্তান সবাইকে তাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তাদের প্রত্যেকের জবাবদিহি হবে। তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভিত্তিতে। যদি পিতা-মাতা সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে থাকে তাহলে তারা পাকড়াও হবে। যদি সন্তান পিতা-মাতার জন্য পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর

সন্তান যদি সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকে এবং পিতা-মাতার বৈধ অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ত্রুটি না করে থাকে। কিন্তু পিতা-মাতা কেবলমাত্র পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী না হবার কারণে তাকে নির্যাতন করে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ বলছেন যে, কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।

তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের পিতামাতার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করেছ এবং তোমাদের দ্বীনের উপর যে দৃঢ়পদ থেকেছ তার জন্য পুরস্কৃত করব। আর আমি তোমাকে সৎবান্দাদের সাথে হাশর করব, তোমার পিতা-মাতার দলে নয়। যদিও তারা দুনিয়াতে তোমার সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল। কারণ, একজন মানুষের হাশর কিয়ামতের দিন তার সাথেই হবে, যাকে সে ভালবাসে অর্থাৎ দ্বীনী ভালবাসা। তাই পরবর্তী আয়াতে বলেছেন যে, "আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব।" [ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ

৯. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা সৎ আমল করবে ও ঈমান নিয়ে আসবে তিনি তাদেরকে সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর তারা তাদের এ সকল সৎ আমলের কারণে জান্নাতে অনাবিল আনন্দে বসবাস করবে। যেখানে তারা শুধু সুখই ভোগ করবে, কোন দুঃখ তাদেরকে স্পর্শ করবে না। এটা মূলত তাদের সৎ আমলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কারণেই। তাই আমাদের উচিত সর্বদা ভাল আমল করা এবং মন্দ আমল করা থেকে বিরত থাকা। [ফাতহুল মাজীদ]

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَ لَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ

১০. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নিগৃহীত হয়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে। আর আপনার রবের কাছ থেকে কোন সাহায্য আসলে তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম সৃষ্টিকুলের অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন?

যদিও বক্তা এক ব্যক্তিমাত্র কিন্তু সে "আমি ঈমান এনেছি" বলার পরিবর্তে বলছে, "আমরা ঈমান এনেছি"। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইংগিত রয়েছে তা হলো মুনাফিক সবসময় নিজেকে মুমিনদের মধ্যে শামিল করার চেষ্টা করে থাকে এবং নিজের ঈমানের উল্লেখ এমনভাবে করে থাকে যাতে মনে হয় সেও ঠিক অন্যদের মতই মুমিন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন কোন কাপুরুষ যদি কোন সেনাদলের সাথে গিয়ে থাকে এবং সেনাদলের অসম সাহসী সৈনিকেরা লড়াই করে শত্রুদলকে বিতাড়িত করে দিয়ে থাকে তাহলে কাপুরুষটি নিজে কোন কাজে অংশ গ্রহণ না করে থাকলেও সে এসে লোকদেরকে বলবে, আমরা গিয়েছি, আমরা ভীষণ যুদ্ধ করেছি এবং শত্রুকে

পরাস্ত করেছি। অর্থাৎ সেও যেন সেই অমিত সাহসী যোদ্ধাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল। [আত-তাফসীরুল কাবীর]

আল্লাহর আযাবের ভয়ে যেমন কুফরী ও গোনাহ থেকে বিরত থাকা উচিত এ ব্যক্তি ঠিক তেমনি বান্দা প্রদত্ত নির্যাতন-নিগ্রহের ভয়ে ঈমান ও সৎকাজ থেকে বিরত হয়েছে। ঈমান আনার পর যখন সে কাফেরদের হুমকি, মারধর ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয় তখন সে মনে করে যে এটা বোধ হয় আল্লাহর শাস্তি তখন সে ঈমান থেকে সরে যায়। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, তখন সে এমন পেরেশান হয়ে যায় যে রকম পেরেশান হতে হয় আল্লাহর আযাবের ক্ষেত্রে। ফলে মুরতাদ হয়ে যায় [মুয়াস্‌সার] অথবা আয়াতের অর্থ, তারা মানুষের নির্যাতনের সম্মুখীন হলে সে নির্যাতন তাদের জন্য দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া বা মুরতাদ হওয়ার কারণে পরিণত হয়, যেমন আল্লাহর আযাব কুফরি ও গোনাহ থেকে ফিরে থাকার কারণ হয়। এ আয়াতের সমর্থনে অন্য আয়াত হচ্ছে, "আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে; তার মংগল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে এবং আখেরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।" [সূরা আল হাজ্জ: ১১]

আজ সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কাফেরদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং মুমিনদের পক্ষ ত্যাগ করেছে। কারণ সত্য দ্বীনের সম্প্রসারণের জন্য নিজের গায়ে আঁচড়টি লাগাতেও সে প্রস্তুত নয়। কিন্তু যখন এ দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদেরকে আল্লাহ সাফল্য ও বিজয়-দান করবেন তখন এ ব্যক্তি বিজয়ের ফল গনীমতের মাল ভাগ করে নেবার জন্য এসে যাবে এবং মুসলিমদের বলবে, আমি তো মনে প্রাণে তোমাদেরই সাথে ছিলাম, তোমাদের সাফল্যের জন্য দো'আ করছিলাম এবং তোমাদের প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও কুরবানীকে আমি বিরাট মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছি। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যারা তোমাদের অমংগলের প্রতীক্ষায় থাকে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জয় হলে বলে, "আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না।" আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি?" [সূরা আন-নিসা: ১৪১]

আরও বলেন, "আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই। অতঃপর তোমাদের কোন মুসীবত হলে সে বলবে, তাদের সংগে না থাকায় আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হলে, যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই এমনভাবে বলবেই, 'হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম। তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।" [সূরা আন-নিসা: ৭২–৭৩] আরও বলেন, "অতঃপর হয়ত আল্লাহ বিজয় বা তার কাছ থেকে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সে জন্য লজ্জিত হবে।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৫২] মোটকথা পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বলেছেন যে, তিনি সৃষ্টিকুলের অন্তরের সব খবর জানেন। [আদওয়াউল বায়ান]

وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ

১১. আর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক।

আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, আল্লাহ অবশ্যই জানবেন কারা ঈমান এনেছে, আর অবশ্যই জানবেন কারা মুনাফিক। আল্লাহর এ জানার অর্থ প্রকাশ করে দেয়া। যাতে করে মুমিনদের ঈমান ও মুনাফিকদের মুনাফিকির অবস্থা যাতে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং যার মধ্যে যা কিছু লুকিয়ে আছে সব সামনে এসে যায় সে জন্য আল্লাহ বারবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর] একথাটিই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ মুমিনদেরকে কখনো এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় এখন তোমরা আছে (অর্থাৎ সাচ্চা ঈমানদার

ও মুনাফিক সবাই মিশ্রিত হয়ে আছো) যতক্ষণ না তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেবেন।" [সূরা আলে ইমরান: ১৭৯]

আরও এসেছে, "আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমরা জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি।" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩১] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শুধু তাঁর জ্ঞান অনুসারে কোন ফয়সালা করতে চান না। তিনি চান তাদের অন্তরের লুকানো বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ুক। আর সে জন্যই তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। যাতে কিয়ামতের মাঠে বলতে না পারে যে, আপনি আমাদের যদি পরীক্ষা করতেন হয়ত আমরা সে পরীক্ষায় টিকে যেতাম।

ۘ وَ قَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لِلَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوۡا سَبِيۡلَنَا وَ لۡنَحۡمِلۡ خَطٰيٰكُمۡ ۘ وَ مَا هُمۡ بِحٰمِلِيۡنَ مِنۡ خَطٰيٰهُمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ ؕ اِنَّهُمۡ لَكٰذِبُوۡنَ

১২. আর কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর তাহলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। কিন্তু ওরা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

কুরাইশ সর্দারদের এ উক্তিটি ছিল সেসব ঈমানদারদের প্রতি যারা তাওহীদ ও আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করত। তারা তাদেরকে তাওহীদের কথা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন, হাশর-নশর, হিসেব ও শাস্তি-পুরস্কার সম্পর্কে বলত, এসব কথা একদম বাজে ও উদ্ভট। কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি আখেরাতের কোন জীবন এবং সেখানে জবাবদিহির কোন বিষয় থেকেই থাকে, তাহলে তার দায়ভার আমরা গ্রহণ করছি। আল্লাহর সামনে সমস্ত শাস্তি ও পুরস্কারের বোঝা আমরা মাথা পেতে নেবো। আমাদের কথায় তোমরা এ নতুন দ্বীন ত্যাগ করো এবং নিজেদের পিতৃ পুরুষের দ্বীনের দিকে ফিরে এসো।

'মিথ্যাচার' মানে তারা যে বলেছিল "তোমরা আমাদের অনুসরণ করো এবং তোমাদের গোনাহগুলো আমরা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো।" এটা পুরোপুরি মিথ্যাচার। [দেখুন: মুয়াসসার] কারণ কিয়ামতে একে অপরের বোঝা কখনও বহন করবে না। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, "আর কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও তা বহন করতে ডাকে তবে তার থেকে কিছুই বহন করা হবে না— এমনকি নিকট আত্মীয় হলেও।"। [সূরা ফাতির: ১৮] আরও বলেন, "আর সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ নেবে না, তাদেরকে করা হবে এককে অন্যের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তানসন্ততিকে—" [সূরা আল-মা'আরিজ: ১০-১১]

وَ لَيَحۡمِلُنَّ اَثۡقَالَهُمۡ وَ اَثۡقَالًا مَّعَ اَثۡقَالِهِمۡ ۫ وَ لَيُسۡـَٔـلُنَّ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ

১৩. তারা তো বহন করবে নিজেদের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা; আর তারা যে মিথ্যা রটনা করত সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

কাফেররা মুসলিমগণকে বলত, তোমরা অহেতুক আখেরাতে শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে আখেরাতে শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে, আমাদেরই হবে। [ইবন কাসীর] সাধারণ মুসলিমগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের উক্তির জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

আখেরাতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করবেই না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। তাছাড়া তোমাদের পাপভোর বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে- একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদের বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে। [ইবন কাসীর]

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় এ নিয়মটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "যাতে কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝাও পুরোপুরি বহন করে এবং এমনসব লোকদের বোঝার একটি অংশও বহন করে যাদেরকে তারা জ্ঞান ছাড়াই গোমরাহ করে।" [সূরা আন-নাহল: ২৫] আর এ নিয়মটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিমোক্ত হাদীসটিতে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে আহবান জানায় সে তাদের সমান প্রতিদান পাবে যারা তার আহবানে সাড়া দিয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে, এ জন্য তাদের প্রাপ্যে কোন কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহবান জানায় সে তাদের সবার সমান গোনাহের ভাগী হবে যারা তার অনুসরণ করে এবং এ জন্য তাদের গোনাহের মধ্যে কোন কমতি করা হবে না।" [মুসলিম: ২৬৭৪]

ফুটনোট

⊡ ঈমান, শুধুমাত্র মুখে দাবি করার মতো কোনো বিষয় নয়; বরং এর সঙ্গে থাকে নানা ধরনের পরীক্ষা। ঈমানদার ব্যক্তিকে কাজে-কর্মে একথা প্রমাণ করতে হবে যে, ঈমান রক্ষার জন্য সে যেকোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

⊡ ইতিহাসের নানা পরিক্রমায় মহান আল্লাহ তার বান্দাদের পরীক্ষা নিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জীবনের কোনো না কোনো সময় পরীক্ষায় পড়তে হয়। ধনি ব্যক্তিকে ধন দিয়ে, গরীবকে দারিদ্র দিয়ে, ক্ষমতাসীনকে ক্ষমতা দিয়ে এবং দুর্বলকে অক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। মানুষকে তার ঈমান অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। যার ঈমান যত মজবুত তার পরীক্ষা তত কঠিন।

⊡ অনবরত পাপকাজ করতে থাকলে তা মানুষের চিন্তাধারার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে সে আল্লাহ ও তার সৃষ্টিজগত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে থাকে।

⊡ মানুষ যা আমল করে তা আমলকারীর ওপর বর্তাবে, ভাল করলে ভাল আর মন্দ করলে মন্দ। ঈমানদার সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে তা থেকে তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন এমনকি আরো উত্তম প্রতিদান দেন।

⊡ এখানে জিহাদের যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ সব সময় তলোয়ার নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া নয়। এখানে জিহাদের অর্থ চেষ্টা ও সংগ্রাম করা। নিজের নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম উভয়কেই এই জিহাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই দুই ধরনের জিহাদেই লাভ হবে মুসলমানদের।

⊡ আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা ও সংগ্রাম করলে তিনি আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং আমাদের প্রচেষ্টার উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবেন।

⊡ সর্বদা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তারা খারাপ ব্যবহার করলেও তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা যাবে না। পিতা-মাতা যদি আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্ক করার নির্দেশ দেয় শুধু সেক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা যাবে না।

⊡ মানুষকে সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরে যেতে হবে। সৎ কর্ম করলে সৎ কর্মশীলদের মধ্যে শামিল হওয়া যায়।

⊡ কিছু মানুষের ঈমান শুধু মুখে প্রকাশ পায়; অন্তরে প্রবেশ করে না। কাজেই কেউ নিজেকে ঈমানদার দাবি করলেই তার কথা বিশ্বাস করা যাবে না। কঠিন ও বিপদের দিনগুলোতেই খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তিদের চেনা সম্ভব।

⊡ ঈমানদার ব্যক্তিকে অনেক সময় চরম বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তিরা এ ধরনের বিপদের দিনে ধৈর্য ধরে এবং আল্লাহর সাহায্য চায়।

⊡ মুনাফেক হচ্ছে সুযোগ-সন্ধানী ব্যক্তি। বিপদের সময় ও কঠিন দিনে সে পালিয়ে থাকে এবং বিজয়ের দিনে সে নিজের ডেরা থেকে বেরিয়ে এসে বিজয়ী জনতার কাতারে মিশে যায়। সে নিজেকে মুমিনদের সহযোগী দাবি করে যুদ্ধজয়ের গনিমাত বা ক্ষমতার অংশ দাবি করে বসে।

⊡ প্রত্যেককে তার পাপের বোঝা বহন করতে হবে। অসৎ কাজ করা ও অসৎ কাজের পথ দেখানো সমান অপরাধ।

⊡ কাফিররা বিভিন্ন কৌশল ও লোভ দেখিয়ে মুসলিমকে পথভ্রষ্ট করতে চাইবে, সুতরাং সর্বদা সাবধান থাকতে হবে, কখনো তাদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হওয়া যাবে না।